অপেক্ষা

- রাজর্ষি ভট্টাচার্য

আজ বিকেলটা প্রথম থেকেই যেন এটা মনমরা। এক ভ্যাপসা গরম গত কয় দিন থেকেই শহরের উপর চেপে বসেছিল, আজ যেন তার উৎপাত টা একটু বেশীর দিকে। ভিড়ের রাস্তা ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে বাইকে বসেই ঘামছিল শুভ্র।

অন্তরার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল বছরখানেক আগে। একসাথে চাকরি তে ঢুকেছিল দুইজন, যদিও বছর খানেক পরেই চাকরিটা ছেড়ে দেয় অন্তরা। "বাড়ি থেকে এতটা দূরে, একদমই ভাল লাগছে না রে," শেষের দিন বলেছিল ও। শুভ্র সেদিন ভেবে পায়নি কি করবে, কিভাবে আটকাবে তাকে, বদলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অন্তরার চলে যাওয়ার দিকে। সেদিন অফিস শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ বসেছিল শুভ্র। চেষ্টা করছিল কষ্টের ডেলাটাকে গলা বেয়ে উপরে উঠতে না দেবার।

এখন রাস্তায় বিরক্ত হচ্ছিল শুভ্র। আজ যেন ভাগ্যও ওর সাথে নেই, একটার পর একটা লাল বাতি তে আটকাচ্ছে, সামনের লম্বা গাড়ি ও বাইকের লাইন যেন শেষ হবার নামই নেই। বিরক্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুভ্র, ছটা বাজতে আর দশ মিনিট, কপাল ভাল থাকলে এখনও সময়মত পৌঁছে যেতে পারে, অন্তত আজ অন্তরাকে অপেক্ষা করাতে চায় না ও।

"এতটা বেখেয়ালি হয়ে চলে ?" বলেছিল অন্তরা, ওর ভাড়া বাড়ির সামনে রাস্তায় দাড়িয়ে। কিছু না বলে কান এঁটো করে হেসেছিল শুভ্র, প্রথম দিনেই দশ মিনিট দেরি। দোষ খুব একটা তার ছিল না যদিও, কি পরে আসবে তা ঠিক করতেই কেটে যায় অনেকক্ষণ, প্রথম দিন দেখা, একটু ফিটফাট হয়ে আসাটাই তো দস্তুর। একসাথে অফিসে যাবার প্রস্তাব টা শুভ্র দেয় চাকরি তে জয়েন করার পরের দিনই। "আরে, তুমি তো থাকো আমার বাড়ির পাশেই, আপত্তি না থাকলে সকালে আমি তোমাকে পিক করে নিতে পারি," বলেছিল সে। "দেরি করা চলবে না কিন্তু," হেসে জবাব দিয়েছিল অন্তরা।

তার পর থেকে প্রতিদিন তারা একসাথে অফিসে আসত, একসাথে বাড়ি ফিরত। অন্তরার কোনোদিন কোন কারণে দেরি হলে অপেক্ষা করত শুভ্র, তার দেরি হলে আরও কাজের বাহানায় বসে থাকত অন্তরা। রবিবার ছুটির দিন টা বড় অস্বস্তিতে কাটত শুভ্রের। সোমবারের অধৈর্য অপেক্ষা তাকেই অবাক করত। চিরকালের অলস শুভ্রের এই পরিবর্তন নজর এড়ায়নি তার বন্ধুদেরও। "নির্ঘাত প্রেমে পরেছিস," বলাবলি করত বন্ধুরা, আর তার প্রতিবাদ করার খুব চেষ্টা করলেও কোথায় যেন আটকে যেত ও।

ধীরে ধীরে ছুটির দিনের সেই একাকীত্ব অন্তরাও অনুভব করতে থাকে। এক রবিবার শুভ্র কে ফোন করে কফি খেতে যাবার আমন্ত্রন দিলে সেও আপত্তি করতে পারে না। কফির পর সিনেমা, তারপর রাতের খাবার খেয়ে ফেরত আসা টা খুব অল্পদিনেই দুজনের অভ্যাসে পরিণত হয়। অন্তরা লম্বা ছুটিতে বাড়িতে গেলে দিনগুলো কিভাবে কাটত তা শুধু শুভ্রই জানে, আবার তাকে ছাড়া অন্তরাও যে খুব ভাল থাকত না, তা দুজনেরই অজানা ছিল না।

সম্পর্কের নমনীয়তা বাড়তে থাকে সময়ের সাথে সাথে, তুমি থেকে তুই হতেও তাই খুব একটা দেরি হয়না। কিন্তু প্রতিদিনের একসাথে থাকার চাহিদার সাথে সাথে বাড়তে থাকে কাজের চাপও। ছুটোছুটি বাড়তে থাকে দিন দিন, শুভ্রের অফিসের বাইরে, অন্তরার অফিসের ভেতরে। এক রবিবারে অতিরিক্ত কাজের জন্য অফিসে আটকে যাবার পর পরের রবিবার দেখা না করার সিদ্ধান্ত নেয় দুজনই। ছুটির দরকার হয় শরীর আর মনের, কিন্তু এর সাথেই যে লুকিয়ে উঁকি মারে দূরত্ব বাড়ার অবধারিত লক্ষণ, তা নজর এড়িয়ে যায় দুজনেরই।

কাজের ফাঁকে অফিসে দেখার সময় তাদের কথা জুড়ে থাকে কাজের আলোচনা, অফিসের পর দেখা হলে তাতে থাকে কলিগদের নিয়ে গল্পগাছা। খুব তাড়াতাড়ি দুজনের নিজস্ব সময়ে ভাগ

বসাতে থাকে কর্মক্ষেত্র, যা তারা বুঝতেও পারে না। অফিসের গল্পের সাথেই আসতে থাকে এক অবসাদ, এক নির্লিপ্তি, সম্পর্কে প্রথম মেঘের ছায়া পরে তাদের।

সেই মেঘের প্রভাব বুঝতে দেরি করে দুজনেই। খুব ধীরে সেই মেঘ দখল করে নেয় তাদের পুরো আকাশটাকেই। "সামনের সপ্তাহে বাড়ি যাচ্ছি রে, এবার ফিরতে দেরি হবে একটু, ফোন হয়ত খুব বেশি করতে পারব না, অনেক কাজ আছে বাড়িতে," একটানা বলে থেমেছিল অন্তরা। কিছু না বলে মাথা নেড়েছিল শুভ্র, "চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে আমাকে আবার বেরোতে হবে একবার", বলেছিল সে। সেদিন তার বাইকের পিছনে বসে অন্তরার চোখের দু ফোঁটা জল নজরে পরেনি শুভ্রের, পড়লে হয়ত আটকে রাখত অন্তরাকে, এত সহজে যেতে দিত না।

সেই ছুটির পরই তাল কেটে গিয়েছিলো, এটা বুঝতে পারে তারা। কিন্তু এগিয়ে এসে সম্পর্ক মেরামতির দায়িত্ব নেয় না কেউই। কাজ চলতে থাকে কাজের নিয়মে, সম্পর্কের ভাঙ্গন ও বাড়তে থাকে এর সাথে সাথে। দুজনের পারস্পরিক সময় কমতে থাকে, বাড়তে থাকে দূরত্ব। এমনই এক দিনে অন্তরা জানায় যে সে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। "বাড়ি থেকে এতটা দূরে, একদমই ভাল লাগছে না রে," বলেছিল অন্তরা, "চাকরিটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে ঠিক করব এর পরে কি করা যায়।"

সে দিনের পর কেটে গিয়েছে আস্ত একটি বছর, অন্তরার যাবার পর শুভ্র ও চাকরি ছাড়ে, জয়েন করে আরেক অফিসে। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের তারটা ছিঁড়ে যায় হঠাত করেই। কিছুদিন আগে শুভ্রের মোবাইল এ কল আসে একটি, অচেনা নম্বর, ফোন তুলে দেখে ওপারে অন্তরা, "কেমন আছিস," জিগ্যেস করে ও।

"ভালো", কোনোমতে বলে শুভ্র।

"সামনের সোমবার আসছি, দেখা করিস," বলে অন্তরা।

"হঠাত কি মনে করে ?" জিগ্যেস করে শুভ্র।

ওপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে। অনেকক্ষণ পরে হালকা একটা জবাব ভেসে আসে, "আমার বিয়ে," তারপর আবার একযুগের নীরবতা, "শেষ বারের মত একবার দেখা করতে চাই।"

ভেতরে কিছু একটা ভাঙছে টের পেলেও শান্ত থাকে শুভ্র, জেনে নেয় দেখা করার জায়গা আর সময়, কথা দেয় ঠিক সময়েপৌঁছে যাবার, আর তারপর ফোন কেটে দেয়। ফোন কাটার পর স্তব্ধ হয়ে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ। অনেকটা সময় কিভাবে পেরিয়ে গেল তা বুঝতেও পারল না, যেন এক শতাব্দী পরে জেগে উঠে সে। গিয়ে দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় এসে বসে, আর একটা সময় কালবৈশাখীর ঝড়ের মত ভেঙ্গে পরে বিছানায়।

পর পর তিনটে সিগন্যালে লাল বাতি পেরিয়ে শেষমেশ শুভ্র এসে পৌঁছয় তাদের দেখা করার জায়গায়, সেই ক্যাফে তে যেখানে সে প্রথম নিয়ে এসেছিল অন্তরাকে। বাইক টা পার্ক করানোর জন্য পাশের ছোট্ট গলিতে ঢোকার সময় শুভ্র দেখতে পায় অন্তরাকে। অন্তরা একটি অটো থেকে নামছে, একটি হাল্কা সবজ শারি পরিহিতা অন্তরা যেন আজও সেই আগের মত সময় দাড় করিয়ে দিতে পারে। শুভ্র দেখতে পায় অন্তরার হাতে একটি ছোট ব্যাগ, আর একটি লাল খাম। সে বুঝতে পারে খামের ভেতরে অন্তরার বিয়ের চিঠি অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি। বুঝতে পেরে শুভ্র যেন আর নড়তে পারে না, তার পা গেঁথে যায় শক্ত কংক্রিটের রাস্তায়, ঝাপসা হয়ে আসে চারপাশ, অন্তরা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না সে। তার পৃথিবী জুড়ে এখন এক হালকা সবুজ বৃষ্টি, যেখানে আর কিছুই নেই তার নিজস্ব। শুভ্র দাড়িয়ে থাকে সেখানে, হেলমেট আর মাস্ক না খুলে, দাড়িয়ে থাকে অন্তরার থেকে কয়েক যোজন দূরে, সে জানে, এই দূরত্ব এই জীবনে সে আর পেরোতে পারবে না, এই জীবন নাহয় এখানেই থাক, এই ধূসর সমুদ্রের একপাশে সে, আর এক পাশে অন্তরা। নিঃশব্দে নিজের বিদায় জানায় শুভ্র তার বাইকে চেপে বসে, আর ক্যাফের সামনে অন্তহীন অপেক্ষায় রেখে যায় আর এক জীবনের অন্তরাকে।

সোনার হরিণ

- সৌম্যদীপ চক্রবর্তী

বয়ে যাওয়া শরৎকালীন আবহ
নিয়ে আসে তার বার্তা।
প্রবাহে থাকে তার কোমল পরশ
যা করে আমায় স্নিগ্ধ
হই আমি স্বচ্ছ।
তারই প্রতিচ্ছবি উঁকি মারে
মেঘের আড়ালে
বলে যায় মধুর বাণী।
বলছি আমি যার কথা
ছুটে বেড়াচ্ছে সে।
ভয়ভীতি কে করেছে সে জয়
হয়েছে সে আমার হৃদয়ের মধ্যমনি।
মেলেছে সে যে নিজের পাখনা
নামটি তাহার সোনার হরিণ।।

তোমার বাসা।

- শম্ভু শংকর চক্রবর্তী

ভেসে বড়ায় সেই মানুষ
নিরাগ কাটে এক ঝাপটায়
কি অদ্ভুত স্পর্শ
আমার কান, কপাল, ঘাড়, গলায়।

লহমায় আবদ্ধ হই
থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ি
আহ্ ! সেই গান সোনায়
কোনো আড়ালে চুপিসারে সরগম ধরি।

জানালার কাচে মিটিমিটি জোনাকী
ভোরের কুয়াশার ছবি আঁকা
আমার ঘরে তখন মিরজাগালিব
আর বুকের ঘরে তোমার বাসা।